বিশ্বব্যাংক

তথ্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশে এনজিওর অর্থনীতি ও পরিচালনা ব্যবস্থা

গত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের সামাজিক সূচকগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে দেশের বিভিন্ন সেবাসুবিধা বিস্তৃতির কারণে। বিশেষত এখানে এনজিওগুলোর সম্প্রসারণশীল নেটওয়ার্কগুলোর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এনজিওগুলোর কর্মকান্ডের নানা সমালোচনার মুখেও বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির জন্য এনজিওগুলোর অবদানকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। 'ইকনোমিকস এন্ড গভার্ণেন্স অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এনজিওগুলোকে নিয়ে সৃষ্ট বিদ্যমান বিতর্ক মোকাবেলার কথাও বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে এনজিওগুলো প্রদত্ত সেবা সুবিধার লক্ষ্যই ছিল গরীব জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং গরীব পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছানো এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনেও তারা সক্ষম হয়েছে। বলা যেতে পারে লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে এনজিওগুলো সফল হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। নিচে প্রদত্ত পরিসংখ্যান ছক অনুযায়ী দেখা যায়, এনজিওগুলোর পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রীই অতিদরিদ্র পরিবারের। আর বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই ২০ শতাংশ অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ছে এনজিওগুলোর প্রাথমিক স্কুলে। যা অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে অনেক বেশি।

এনজিওগুলোর এসব সেবামূলক পদক্ষেপের প্রভাব সমাজে ইতিবাচক হয়েছে। পাশাপাশি সমাজে এর মূল্যায়ণও করা হচ্ছে ভালভাবে। সমাজ যে এনজিওগুলোর সেবা নিচ্ছে এবং এর ফলে এক ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। এনজিওগুলোর পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এখন গরীব পরিবারগুলোর প্রায় ৭০ ভাগের কাছে পৌঁছে গেছে। এই ক্ষুদ্র ঋণ শুধু দরিদ্র পরিবারের আয় রোজগারই বাড়ায়নি, বরং আয় বৃদ্ধির স্থায়িত্বও এনে দিচ্ছে। সমাজের অবহেলিত নারীদের ক্ষমতায়নেও সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি সাধন করছে এই এনজিওগুলো। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে নারীরা হচ্ছে স্বাবলম্বী। এছাড়াও সামাজিক খাতে নেয়া বেশ কিছু এনজিও কার্যক্রম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

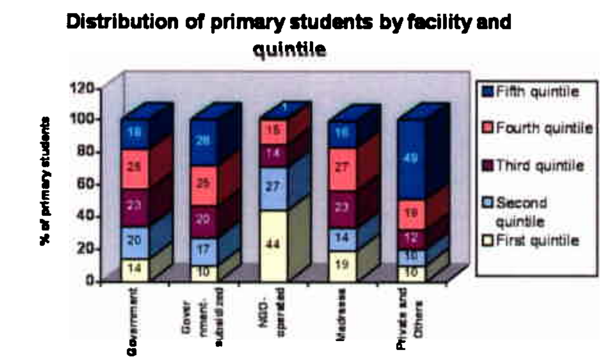

দরিদ্রমুখী বিভিন্ন বিষয়ে এবং সামাজিক নানা ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি করতেও এনজিওগুলোর সহায়ক কর্মসূচি ভাল ফল দিয়েছে। আর একারণেই মূলত গত এক দশকে বাংলাদেশে এনজিওগুলোর কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে। যাকে আজ বিবেচনা করা হচ্ছে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসাবে। এই ধারায় আরো সামনে অগ্রসর হতে এনজিওগুলোকে তাদের সেবামূলক পদক্ষেপ আরো বাড়াতে হবে এবং মান উন্নয়ন করতে হবে। কেননা,

বাংলাদেশের জন্য নেয়া দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্রের (পিআরএসপি) লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নেও এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রয়োগ করতে পারে।

বিগত সময়ে বাংলাদেশে এনজিওগুলোকে প্রদত্ত বিদেশী সাহায্যের পরিমানও বেড়েছে। বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক সাহায্যের তুলনামুলক চিত্র বিশ্লেষণ করলে এনজিওগুলোর সাহায্য প্রবাহ বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। আনুপাতিক হিসাবে বাংলাদেশের মোট সাহায্যের অর্থের মধ্যে এনজিওগুলোর অংশ ১৯৯০-৯৫ সালের ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৫-২০০৪ সালে দাঁড়িয়েছে ২৪ শতাংশে। একই সময়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সুদ আয় কিংবা মুনাফা অর্জনের বিষয়টিও এনজিওগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে এনজিওগুলোর কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে তাদেরকে বিভিন্ন উৎসের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। বিশেষ করে সেবা কর্মসূচির ধরণ অনুযায়ী তাদেরকে অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময় তাকে অর্থের জন্য বাণিজ্যিক উৎসের কাছে যেতে হয়। যদিও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত এখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকার বাজেটারি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় দিয়ে কিংবা উন্নয়ন অংশীদারদের তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক খাতে এনজিও কর্মসূচিকে অর্থায়ন করার ঘটনাও রয়েছে। এতদ্বসত্বেও এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ার আরো উন্নয়ন ঘটানো দরকার। উৎসাহ ব্যাঞ্জক কিংবা সহায়ক কোন কর্মসূচির অর্থের উৎসের জন্য সরকারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই বেসরকারী অনুদান কিংবা বিদেশী অনুদান গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এনজিও নিজস্ব আয়ের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মুনাফা দিয়ে তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অর্থায়ন করছে। যে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ প্রাপ্তির জন্য চমৎকার সমাধান হিসাবে এধরণের উদ্যোগ মডেল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে এনজিওগুলোর উচিত হবে এক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পৃথক বা স্বতন্ত্র্য ভাবে পরিচালনা করার সুযোগ দেয়া। যাতে করে বেসরকারী খাতে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়।

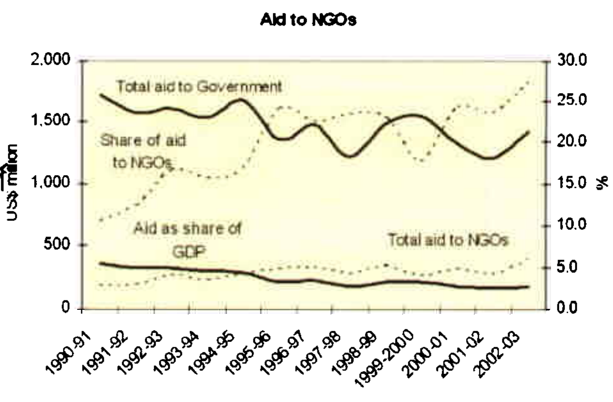

বিদ্যমান অগ্রগতি সত্বেও এনজিও খাতের সম্ভাবনাকে আরো কাজে লাগাতে হলে সরকার, এনজিও, গ্রাহক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে 'কৌশলগত সুসম্পর্ক' স্থাপনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে। তাতে প্রতিটি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে নিজেদের সিদ্ধান্তেই কাজ করার সুযোগ হবে। এর ফলে সমন্বিত যে প্রভাব পড়বে তা লক্ষ্য অর্জনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সহায়ক হবে। তথা বাংলাদেশের গরীবদের মান উন্নয়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে(এমডিজি) সহায়ক হবে।

এই কৌশলগত নিবিড় যোগাযোগ পদক্ষেপের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান ভূমিকা থাকবে একটি আধুনিক আইনী কাঠামোর আওতায় এনজিওগুলোকে মান সম্পন্ন সেবাদানের সুযোগ করে দেয়া। আর এনজিওগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনী কাঠামো গ্রহণ করতে হবে তাদের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে। আইনী কাঠামো হলে এনজিওগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা যেমন বাড়বে, তেমনি পরিচালনার মান উন্নয়নেও সহায়ক হবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ে যে আইনী কাঠামো

বিবেচনাধীন রয়েছে, তার সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের মত গণতান্ত্রিক দেশে এনজিওগুলোর সহায়ক কার্যক্রম জরুরী, সেটাও আইনী কাঠামোতে স্বীকৃত থাকতে হবে। একক রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করা কিংবা নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা বা এ ধরণের অন্য কোন কাজ ছাড়া বাকী সবকিছুতেই তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বাড়াতে সরকার এনজিওগুলোর জন্যও পৃথক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা তথা পৃথক এনজিও কমিশন গঠন করতে পারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে এধরণের সংস্থা বিদ্যমান রয়েছে। একই সঙ্গে বাজেটের মাধ্যমে যে সব সাহায্যের অর্থ এনজিওগুলোর কাছে যায়, সে সব অর্থ ব্যবহারের কার্যকারিতা বাড়াতে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ার শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সাফল্য এবং এনজিওদের সঙ্গে এই সংস্থার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। সরকার-এনজিও কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল (জিএনসিসি) পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে এনজিও এবং সরকারের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

দাতাগোষ্ঠী বা উন্নয়ন সহযোগীদের উচিত বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা। এনজিওগুলোর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দুটি বিশেষ দিককে এগিয়ে নেয়া হবে। এর একটি হচ্ছে-গরীবদের মাঝে প্রয়োজনীয় সেবা সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে ব্যাপকভিত্তিক সুশীল সমাজের অগ্রযাত্রায়ও সহায়ক হবে। তবে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলাদেশী সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের কাছে এনজিওগুলোর জবাবদিহিতাকে খাটো করে দেখা হবে না। প্রকল্পের দুর্বল রূপরেখা প্রণয়ন কিংবা অপর্যাপ্ত তদারকির জন্য দাতাদেরও জবাবদিহিতা থাকা দরকার। বিশেষ করে যেখানে এনজিও জড়িত থাকে। কারণ, এধরণের পরিস্থিতি তথা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগত কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অসন্তোষজনক হতে পারে। কাজেই এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিক খাতের কর্মকান্ডে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করা উচিত। যেমনটি করা হয়ে থাকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন তথা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে। এধরণের কৌশলের প্রয়োজন ওসব কর্মকান্ডের টেকসই উন্নয়ন সাধন তথা অব্যাহত এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আর কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার এবং এনজিওগুলোর যৌথ মতামত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বাজেটের মাধ্যমে সরকার মধ্যমেয়াদে বিভিন্ন সামাজিক খাতে অর্থায়ন করে আসছে। আবার যেসব কর্মসূচিতে যেমন, এডভোকেসি কর্মসূচির ক্ষেত্রে যদি সরকারের সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে- সেখানে দাতাগোষ্ঠী এনজিওগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পারে। দাতাসংস্থাগুলোর উচিত অর্থ লেনদেনের প্রক্রিয়াগত ব্যয় কমিয়ে আনা। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বাড়ানো, হিসাবাদি সংরক্ষণ পদ্ধতির সমন্বয় সাধন এবং সংস্থাটির প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।

এনজিওগুলোর উচিত সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা নিয়ে এগুনো। যদি তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশীদার হিসাবে অব্যাহত ভূমিকা রাখতে চায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন ১) আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং কর্পোরেট গভর্ণেন্স চালু করা, ২) এনজিওগুলো সম্পর্কে মানুষের বিদ্যমান ভুল ধারণাগুলো দূরীকরণে আর্থিক ও বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য জনসমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া এবং এই প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধন, ৩) স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় পর্যায়ে সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যাতে সরকার-বেসরকারী খাত এবং সমাজের সেবা-সুবিধাদির ক্ষেত্রে সাহায্যকারীর ভূমিকায় কাজ করা যায়। ৪) নিজেদের দক্ষতার সীমাবদ্ধতা এবং জাতীয় উন্নয়ন চাহিদাকে ভিত্তি করে কৌশলগত নির্দেশনাগুলোর পর্যালোচনা ও পুনস্থির করা, ৫) উন্নয়ন কর্মসূচির জটিলতা দূরীকরণে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা স্তর গঠন করা।

চাহিদা এবং সেবাখাতের তদারকিতে দক্ষতা বাড়াতে গ্রাহকরাও কৌশলগত সমন্বিত পদক্ষেপকে সমর্থন করতে পারে। যেমন, সরকার, এনজিও এবং বেসরকারী খাতে সেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় চালান বা প্রমান পত্র ব্যবস্থারও চালু করা যেতে পারে। কিংবা পছন্দমত এধরণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

এপ্রিল ২০০৬

যোগাযোগ

রিজওয়ান আলম (৮৮০২) ৮১৫-৯০১৫, এক্সট: ৪২৪২, ইমেইল: salam3@worldbank.org

এই প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করতে চাইলে বিশ্বব্যাংক অফিসে রেহনুমা আমিন কিংবা রাজিয়া রউফের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথব ওয়েব সাইট থেকেও সংগ্রহন করা যাবে। ওয়েব সাইটের ঠিকানা: www.worldbank.org.bd/bds

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে দেখুন:
www.worldbank.org.bd অথবা www.worldbank.org